ইউনিট ৬
অনিশ্চিত উৎস্য থেকে
উদ্ভূত রোগসমূহ

ইউনিট ৬ অনিশ্চিত উৎস থেকে উদ্ভূত রোগ

মাছের স্বাভাবিক জীবন ধারণের মাধ্যম পুকুর বা জলাশয়ের পানি। জলাশয়ের প্রতিটি স্তরে যে বন্য মাছ (Wild fish) থাকে তা অন্যান্য চাষযোগ্য মাছের জন্য রোগের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। মাছ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীও (যেমন- শামুক) বিভিন্ন পরজীবীর পোষক (Host/Carrier) হিসেবে পরিচিত। বিষাক্ত ব্লুম সৃষ্টিকারী ফাইটোপ্লাংকটনের জন্যও মাছ অসুস্থ হতে পারে। বিভিন্ন নীলাভ-সবুজ শৈবাল (যেমন (*Microcystis* sp.)এর প্রাচুর্যতা মাছের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এছাড়াও তাপমাত্রা, P^H, লবণাক্ততা, অপদ্রব্য, দূষণ ইত্যাদি ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেও মাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে, এমনকি মাছ মারাও যেতে পারে। অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত পুষ্টির সরবরাহ ও ভিটামিনের স্বল্পতা মাছকে দুর্বল ও অসুস্থ করে তোলে। স্বাস্থ্যসম্মত দূষণমুক্ত পরিবেশে মাছ সুস্থ ও সবল থাকে। সর্বোপরি পুষ্টিকর খাদ্য, বৈজ্ঞানিক ও দক্ষ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় রোগের প্রকোপও হ্রাস পায়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পরিবেশ ও তার প্রভাবকসমূহ নীলাভ দাগ রোগ, রক্তাল্পতা, থাইরয়েড টিউমার, চক্ষু প্রসারণ রোগ, ইয়োকস্যাক রোগ ও ডিম রোগ, আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির রোগ, একটি মাছ/চিংড়ি ব্যবচ্ছেদ করে আক্রান্তকরণ শনাক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে তাত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ পরিবেশ ও তার প্রভাবকসমূহ

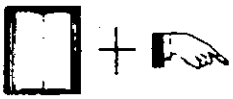

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ বলতে কী বুঝায় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পরিবেশ, পোষক ও রোগজীবাণুর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবেশের প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মাছের রোগ সৃষ্টি করতে পরিবেশের প্রভাবকগুলোর প্রভাব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিবেশের প্রভাবকজনিত কারণে মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

পরিবেশ

মাছে রোগ সৃষ্টিতে পরিবেশের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। পরিবেশের প্রভাবকসমূহ রোগজীবাণুর সহায়তায় মাছে সহজেই রোগের সৃষ্টি করতে সক্ষম।

কোন জীবের পরিবেশ হলো তার অবস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। মাছ বা জলজ প্রাণীর পরিবেশ হলো তার বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ পানি এবং তার সংশ্লিষ্ট ভৌতিক রাসায়নিক ও জৈবিক অবস্থা। মাছে রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ ৩.১ পাঠে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অত্র পাঠে পরিবেশ ও তার প্রভাবকসমূহ সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে আলোচনা করা হলো। মাছে বা চিংড়িতে রোগ সৃষ্টিকারী সর্ব প্রধান দু'টি প্রভাবকের প্রতিক্রিয়া বা সম্পর্ক নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো (চিত্র:৪৪)। মাছে রোগ সৃষ্টিতে পরিবেশের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। পরিবেশের প্রভাবকসমূহের ক্রিয়ার ফলে রোগজীবাণু সহজেই মাছে রোগ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়।

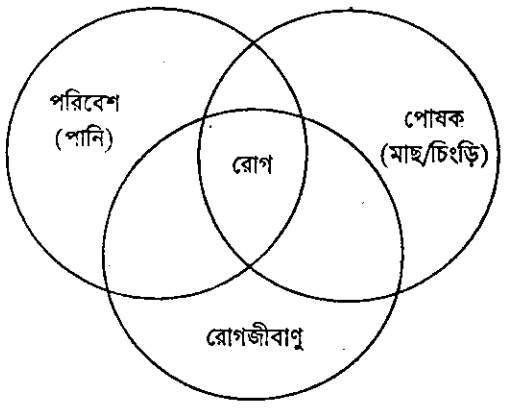

চিত্র ৪৪ : পোষক, পরিবেশ ও রোগজীবাণুর সম্পর্ক বা প্রতিক্রিয়া

পারিবেশিক প্রভাবকসমূহ ও তাদের প্রভাব

পানিতে বসবাসকারী মাছ বা চিংড়ি বা যে কোন জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রভাবক সমুহ উৎপাদনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মাছের বা চিংড়ির বা জলজ যে কোন প্রাণীর রোগ সৃষ্টিতে এ সকল প্রভাবকসমূহের ক্ষতিকর ও অস্বাভাবিক প্রভাব অনেকাংশে দায়ী। নিম্নে এ সকল প্রভাবক ও মাছের ওপর এদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। এর সংগে উদ্ভূত সমস্যা বা রোগের প্রতিকার করার উপায়ও উল্লেখ করা হলো।

১। ভৌত প্রভাবক (Physical Factor)

ভৌত প্রভাবকের মধ্যে তাপমাত্রা, সূর্যালোক এবং পানির ঘোলাত্ব গুরুত্বপূর্ণ।

তাপমাত্রা (Temperature)

পারিবেশিক ভৌত প্রভাবকসমূহের মধ্যে পানির তাপমাত্রা, সূর্যালোক এবং পানির ঘোলাত্ব মাছে রোগ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ভৌত প্রভাবকগুলোর মধ্যে পানির তাপমাত্রা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মাছের বর্ধন, রোগজীবাণুর অবস্থান এবং এদের বংশ বিস্তার পানির তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল । অধিক তাপের ফলে মাছ পীড়নের মধ্যে পতিত হয় যার ফলে রোগজীবাণু আক্রমণের সুযোগ পায়। আবার দীর্ঘ্য সময় যাবৎ নিম্ন তাপমাত্রায় মাছ শীতল অভিঘাত (Cold Shock) এর শিকার হয়। ফলশ্রুতিতে মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রক্তে কোষ ভাঙ্গন দেখা দেয়। সর্বোপরি রোগজীবাণুগুলোর আক্রমণের ক্ষমতা তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ সরূপ-ব্যাকটেরিয়াজনিত "কলামনারিস রোগ" ১৫° সে. এর নিচে পানির তাপমাত্রা থাকলে তা মাছে দেখা দেয় না। আবার ব্যাকটেরিয়াল গিল রোগ ২১° সে. এর উপর তাপমাত্রা থাকলে দেখা দেয় না। সুতরাং তাপমাত্রা মৎস্য রোগ সৃষ্টি বা বিস্তারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পানি পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করা যেতে পারে।

সূর্যালোক (Sun Light)

সুর্যালোকের প্রভাবে পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রভাবিত হয়। কিছু কিছু মাছের ডিম ও লার্ভা সূর্যালোকের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। অধিকন্তু তীব্র সূর্যালোকের প্রভাবে অনেক মাছের পৃষ্ঠদেশ, মাথা ও পাখনায় ক্ষতের সৃষ্টি করে। পুকুরে কিছু পদ্ম বা শাপলা গাছ, পাড়ে কিছু নারিকেল গাছ লাগিয়ে কিছুটা ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়- তবে বেশি ছায়া যেন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ঘোলাত্ব (Turbidity)

ঘোলাত্ব পানির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস করে। মাছের ফুলকায় ঘোলাত্বের কনা জমে শ্বাস কষ্টের সমস্যা ঘটায়, মাছের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় এবং ত্বকে ঘোলাত্বের কনার ঘর্ষণে ক্ষতের সৃষ্টি করে ফলে রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কিছু শেহড়া গাছের ডাল এবং চুন (১/২ কেজি প্রতি শতাংশে) মিশালে ঘোলাত্ব কমে যায়।

২। রাসায়নিক প্রভাবক (Chemical Factor)

পানির রাসায়নিক প্রভাবকের প্রভাবে মাছ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, মাছের মৃত্যু ঘটতে পারে- তা ছাড়া পরোক্ষভাবে রোগজীবাণুর আক্রমণে সহায়তা করে। এদের মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন, পি. এইচ, দূষক, অ্যামেনিয়া, নাইট্রাইট এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল প্রভাবক গুলো মৎস্য উৎপাদনে যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো। একই সংগে সমস্যাগুলোর সমাধানের উপদেশ ও উল্লেখ করা হলো।

রাসায়নিক প্রভাবক-গুলোর মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন, পি এইচ, দূষক, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট এবং হাইড্রো-জেন সালফাইড অতি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved Oxygen, O_2)

বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মাছেরও অক্সিজেন একান্ত প্রয়োজন। মাছ এই অক্সিজেন পানি থেকে সংগৃহীত করে থাকে যা সাধারণত পানির আন্তঃআনবিক স্থানে সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে। পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কম বেশি হওয়ার ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় এমনকি অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু

পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। অনেক মাছ দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ৪ পি.পি.এম. এর নিচে গেলেই অস্বস্তিকর অবস্থায় লাফালাফি শুরু করে- খাবি খায়, পানির উপর ভেসে থাকতে চায়- এ অবস্থাকে হাইপোক্সিয়া (Hypoxia) বলে। আর কম হলে অর্থাৎ ২৫° সে. তাপমাত্রায় ২.৮ পি.পি.এম. এর নিচে অক্সিজেনের মাত্রা গেলে মাছ মারা যাওয়া শুরু করে। আর এভাবে দীর্ঘ সময় অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে তাকে অ্যানোক্সিয়া (Anoxia) বলা হয়। যা হউক অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে হরা (Hora) টেনে বা জাল টেনে পানি নেড়ে দিতে হবে। সম্ভব হলে পচনশীল পাতা বা ডাল পালা থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। কিছু নূতন পানি যোগ করতে পারলে উত্তম । এ ছাড়া অনেকে ২ পি.পি.এম. হারে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) পুকুরে প্রয়োগ করার উপদেশ দেয়। মাছের জন্য ৫-৮.৫ পি.পি.এম. অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত থাকা উত্তম।

গ্যাস এম্বোলিজম/গ্যাস বাবল রেগে (Gas Embolism/Gas Bubble Disease)

পানিতে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন গ্যাসের আধিক্য হেতু মাছে এ রোগ হয়ে থাকে যাতে মাছের মৃত্যুও ঘটতে পারে। দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ১০ পি.পি.এম. বা তার অধিক হলে এ রোগ দেখা দিতে পারে। আবার বায়োবীয় গ্যাসের চাপ বিশেষ করে নাইট্রোজেন গ্যাস পানির গ্যাসের সহিত অসম চাপে পানিতে আধিক্য দেখা দেয় ফলে মাছের পোনা বা লার্ভার ডিম্ব থলের উপরে, মুখে গ্যাসের বুদ বুদ দেখা দেয়। বড় বড় মাছের ত্বকে বা আঁইশের উপরেও গ্যাসের বুদ বুদ দেখা দেয়। এর ফলে মাছের কোষের অভ্যন্তরের রক্ত কনিকা ভেঙ্গে যেতে পারে এবং মাছের তখন মৃত্যু ঘটে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য যদি এয়ারেশন করা হয় তাহলে তা কমিয়ে অথবা বন্ধ রাখতে হবে। মৃদুভাবে পানি নেড়ে গ্যাস বের করার সুবিধা করতে হবে।

পি এইচ (pH)

পানির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব পি.এইচ এর উপর নির্ভরশীল। প্রায় সকল মাছের জন্য অনুকূল pH মাত্রা হচ্ছে ৬.৫-৮.৫। পানির pH ৬.৫ এর নিচে যেতে থাকলে বিশেষ করে ৫ এর নিচে গেলে অম্লত্ব বেশি হয় এবং এ অবস্থায় মাছ এসিডোসিস (Acidosis) এ পতিত হয়। ফলে মাছ ক্ষুধা মন্দা, ওজন হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি সমস্যায় ভুগে। আবার pH খুব বেড়ে গেলে (৯ এর চেয়ে বেশি হলে) মাছে যান্ত্রিক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থাকে অ্যালকালোসিস (Alkalosis) বলা হয়।এসিডোসিস দেখা দিলে pH এর মাত্রা অনুযায়ী পুকুরে প্রতি শতাংশে ১/২-১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করলে প্রতিকার পাওয়া যায়। আবার অ্যালকালসিস হলে পুকুরে ১/২-১ কেজি লবণ প্রতি শতাংশে দিলে উপকার পাওয়া যায়। অনেকে আমগাছের ডাল এবং তেঁতুল গাছের ডাল পানিতে ডুবিয়ে রাখার পরামর্শ দেন।

দূষক (Pollutant)

পারিবেশিক প্রভাবকগুলোর মধ্যে দূষক অত্যন্ত মারাত্মকভাবে সকল শ্রেণীর মাছসহ জলজ প্রাণীর ক্ষতি সাধন করে এবং পরিশেষে মাছের মৃত্যু ঘটে এমনকি ১০০% মাছ মারা যেতে পারে। নানা ধরনের দূষক হতে পারে এবং সে অনুযায়ী মাছের উপর প্রভাবও বিভিন্ন হতে পারে। বিষজাতীয় দ্রব্য-বিশেষ করে কৃষিতে ব্যবহৃত ইনসেকটিসাইড, শত্রুতামূলক বিষ প্রয়োগ, কারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পোড়া তেল, ভারী ধাতব বস্তু, পয়ো-নর্দমাবাহিত ময়লা ইত্যাদি পুকুর বা নদীতে পড়লে পানি দূষিত হয় এবং এই দূষণের ফলে মাছের মৃত্যু ঘটে অথবা পরোক্ষভাবে উপাদান হ্রাস পায়, রোগজীবাণুর আক্রমণ সহজ হয়। দূষণের প্রতিকার করার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপনার দ্বারা যাতে দূষক পুকুরের পানিতে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা। দূষকের দ্বারা মাছের মৃত্যু ঘটানো বুঝতে পারলে মাছ সরিয়ে ফেলা উত্তম। পরবর্তীতে পানি বদল করা সম্ভব হলে ভালো। কিছু দিন অপেক্ষা করে বিষক্রিয়া বন্ধের পর পুনরায় মাছ ছাড়া যেতে পারে।

অ্যামোনিয়া (Ammonia, NH_3)

অদ্রবীভূত অ্যামোনিয়া মাছের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। পানিতে এর পরিমাণ ০.১১ পি.পি.এম. এর বেশি হলেই মাছ বা চিংড়ি উভয়ের জন্যই অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং ০.২ পি.পি.এম. এর উর্ধ্বে গেলে মাছের ফুলকায় শ্বাস কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে এবং মৃত্যুর কারণ হয়। অ্যামোনিয়ার আধিক্যের সময় নাইট্রোজেন জাতীয় সার (যেমন- ইউরিয়া) দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। ঘন ঘন জাল টেনে দিতে পারলে ভাল আর এয়াবেশন করতে পারলে উত্তম- বিশেষ করে হ্যাচারির জন্য এ সকল ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী। পি,এইচ এবং পানির তাপমাত্রা বেশি হলে এ গ্যাস আরো বিষাক্ত হয়।

নাইট্রাইট (Nitrite, NO_2)

নাইট্রাইটও একটি নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ। পানিতে এর পরিমাণ ২.৪ পি.পি.এম এর উর্ধ্বে গেলে মাছ ও চিংড়ি উভয়ের জন্য ক্ষতি করে। বিশেষ করে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নাইট্রাইটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এর আধিক্য দেখা দিলে এয়ারেশন করা উচিত। এবং নাইট্রোজেন জাতীয় সার- যেমন ইউরিয়া প্রয়োগ আপাততঃ বন্ধ রাখতে হবে।

হাইড্রোজেন সালফাইড (Hydrogen Sulphide, H_2S)

পুকুরের তলদেশে গাছের পাতা, আবর্জনার পচন, অব্যবহৃত মাছের খাদ্য পচনের ফলে- বিশেষ করে চিংড়ি চাষে কালোমাটি (Black Soil) জমে গেলে হাইড্রোজেন সালফাইডের আধিক্য দেখা দেয়। আবার যে সকল পুকুরে এসিড সালফেট সংযুক্ত মাটি থাকে সে ক্ষেত্রেও এই গ্যাসের আধিক্য দেখা দিতে পারে। চিংড়ি ও মাছ উভয় ক্ষেত্রেই এর পরিমাণ ০.০৩ পি.পি.এম এর উর্ধ্বে গেলেই তা বিষাক্ত বলে বিবেচিত হয়। পি এইচ এর মাত্রা পানিতে কম থাকলে তখন এ গ্যাস আরও বিষাক্ত হয়। পুকুরের তলদেশে যেন ময়লা, আবর্জনার পচনের সুযোগ না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। মাটির গুণাগুণ দেখে পুকুর তৈরি করা উত্তম যেখানে এসিড-সালফেট মাটির পরিমাণ খুবই সামান্য বা নেই। এ ছাড়া তাৎক্ষনিক প্রতিকার হিসেবে পানি পরিবর্তন করে দিতে পারলে উত্তম এবং সেই সাথে কিছু চুন (১/২ কেজি/শতাংশ) প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৩। জৈবিক প্রভাবক (Biological Factor)

জৈবিক প্রভাবকসমূহের মধ্যে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ যা একই পরিবেশে মাছের সংগে অবস্থান করে। এদের ক্ষতিকর এবং উপকারী উভয় প্রকার প্রভাবই মাছের বৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার ওপর প্রতিফলিত হয়।

জলজ প্রাণী (Aquatic Animal)

জলজ প্রাণীর ছোট বড় নানা ধরনের প্রাণীই পানির পরিবেশে বাস করে। একটি পারিবেশিক চেইন তৈরি করেই পরিবেশে বাস্তু সাংস্থানিক (Ecological) সমসতার মাধ্যমে তাদের জীবন কাটায়। এই ভারসাম্যের সমতা হারিয়ে অনেক সময় এক জীব অন্য জীবের ক্ষতি সাধন করে এবং মাছ ও তার স্বীকার হয়। বড় বড় প্রাণী বা মাছ ছোট ছোট মাছ বা পোনা মাছকে শিকার করে- উদাহরণ হিসেবে সাপ, উদ, বোয়াল মাছ, শোল, গজার ইত্যাদি। অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী যেমন জুওপ্লাংকটন মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। আবার ক্ষুদ্র প্রাণী অনেক মাছের প্যারাসাইট এবং রোগ জীবাণু হিসেবে ক্ষতি করে। যা হউক মাছ চাষের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে অবাঞ্চিত প্রাণীকে সরিয়ে ফেলতে হয়-অথবা বিষ প্রয়োগে (রোটেনন, ০.৫ - ১ পি.পি.এম হারে) মেরে ফেলা এবং তৎপর জাল টেনে পুকুর পরিষ্কার করা।

জলজ উদ্ভিদ (Aquatic Plant)

জলজ প্রাণীর মত জলজ উদ্ভিদের মধ্যে ছোট বড় নানা রকম উদ্ভিদ মাছের ক্ষতি এবং উপকার উভয়ই করে থাকে। কোন ভাবেই পুকুরে কচুরী পানা, ডুবন্ত বা ভাসমান শেওলা বা উদ্ভিদ অতিরিক্ত হতে দেয়া উচিত নয়। অবশ্য ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বা ফাইটোপ্ল্যাংকটন (Phytoplankton) মাছের সরাসরি খাদ্য। কিন্তু এদের আধিক্য বা ব্লুম হওয়াটাও মাছের জন্য ক্ষতিকারক। অনেক সময় এ সকল ব্লুম থেকে বিষাক্ত জিনিস নিঃসৃত হয় যা মাছের মৃত্যু ঘটাতে পারে। উদাহরণ সরূপ পুকুরে মিক্রোসিষ্টিস (Microcystis) এর ব্লুম, সমুদ্রে ঘটিত রেড টাইড মাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতি করে। উদ্ভিদ জাতীয় ক্ষুদ্র জীব- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক মাছের রোগ জীবাণু হিসেবে রোগ সৃষ্টি করে যা ইতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া ঠিকমত না হলে পুকুর বা মাছ চাষ উপযোগী পানিতে তার উর্বরতা বৃদ্ধি পায়না বা ঠিক থাকেনা।

অনুশীলন (Activity)ঃ *পরিবেশ বলতে কী বুঝায়? মাছে রোগ সৃষ্টিতে পরিবেশ, রোগজীবাণুর সম্পর্ক উল্লেখ করুন। মাছের ওপর পরিবেশের প্রভাব গুলোর আলোচনা করুন*

সারমর্ম ঃ মাছ, চিংড়ি বা জলজ প্রাণীর পরিবেশ হলো পানি। পানির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রভাবক পানিতে বসবাসকারী মাছের ওপর উপকারী ও ক্ষতিকর উভয় ধরনের প্রভাব ফেলে। ক্ষতিকর প্রভাবে মাছের রোগ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়- ফলে রোগ জীবাণু সহজভাবে আক্রমণ করে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ১০০% মৃত্যু ঘটাতে পারে। ভৌত প্রভাবকগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা, সূর্যালোক এবং ঘোলাত্ব গুরুতপূর্ণ। তাপমাত্রার কম বেশির প্রভাবে রোগ জীবাণুর আক্রমণের তারতম্য ঘটে, সূর্যালোকের সরাসরি প্রভাবে মাছে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে এবং ঘোলাত্বের প্রভাবেও মাছের শরীরে যান্ত্রিক ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ফুলকায় শ্বাসকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। রাসায়নিক প্রভাবকগুলোর মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন, পি-এইচ, দূষক, অ্যামোনিয়া, নাইট্রাইট এবং হাইড্রোজেন সালফাইড উল্লেখযোগ্য। অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা যেতে পারে আবার আধিক্যে গ্যাস বাবল রোগ হয়। পি. এইচ. এর মাত্রা ৬.৫-৭.৫ এর কম বা বেশি হলে মাছের স্বাভাবিক বর্ধন ব্যাহত হয় এমনকি এসিডোসিস বা অ্যালকালোসিস রোগে পতিত হয়। দূষক সরাসরি মাছের মৃত্যু ঘটাতে পারে। তদ্রুপ অ্যামোনিয়া ০.১১পি.পি.এম., নাইট্রাইট ২.৪ পি.পি.এম. এবং হাইড্রোজেন সালফাইড ০.০৩ পি.পি.এম এর উর্ধ্বে গেলে মাছ বা চিংড়ির জন্য বিষাক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটাতে পারে। জৈবিক প্রভাবকও উপকার এবং অপকার উভয় প্রকার প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে রোগজীবাণু হিসেবে, অথবা ফাইটোপ্লাংকটন অনেক সময় ব্লুম করে মাছের জন্য ক্ষতি সাধন করে। যা হউক এ সকল পারিবেশিক প্রভাবকগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মাছ ও চিংড়িকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

১। **সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) **মাছে রোগ সৃষ্টিকারী সর্ব প্রধান দুটি প্রভাবক কী কী?**
- i) **পরিবেশ ও খাদ্য**
- ii) **পরিবেশ ও রোগ জীবাণু**
- iii) **পুষ্টি ও রোগ জীবাণু**
- iv) **যান্ত্রিক ক্ষত ও বংশগত প্রভাবক**
- v) **গ্রন্থির কার্য্যহীনতা ও অস্বাভাবিক কোষ বর্ধন**

খ) পানির তাপমাত্রা কত থাকলে মাছে কলামনারিস রোগ হয় না?
- i) ২৫° সে.
- ii) ২৮° সে.
- iii) ২১° সে.
- iv) ১৫° সে. এর নিচে থাকলে।

২। **সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।**

ক) ৫ - ৮.৫ পি.পি.এম মাছের জন্য উত্তম দ্রবীভূত অক্সিজেন।

খ) অক্সিজেন ও ক্লোরিন গ্যাস বারল রোগের কারণ।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

ক) **মাছের জন্য পানিতে অ্যামোনিয়ার বিপদযুক্ত মাত্রা ----------।**

খ) **---------- প্ল্যাংকটনের ব্লুম মাছের জন্য ক্ষতিকর।**

৪। **এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।**

ক) পানির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব কিসের ওপর নির্ভরশীল?

খ) দীর্ঘ সময় পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে তাকে কী বলে?

পাঠ ৬.২ নীলাভ দাগ রোগ, রক্তাল্পতা, থাইরয়েড টিউমার এবং চক্ষু প্রসারণ রোগ

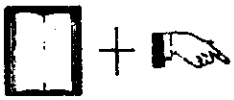

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের নীলাভ দাগ রোগ ও রক্তাল্পতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- মাছের বিভিন্ন অনিশ্চিত উৎস থেকে উদ্ভূত রোগ নির্ণয় ও এই সব রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে লিখতে ও বলতে পারবেন।

নীলাভ দাগ রোগ

পোনা মাছে সাধারণত এই রোগ দেখা গেছে। পেটের নিচে বা কুসুম থলিতে ঈষৎ নীল বর্ণের দাগ দেখা দিয়ে যে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে তাকেই নীলাভ দাগ রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন মাছের নিষিক্ত ডিম্ব থেকে উদ্ভূত লার্ভা এই রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগে লার্ভার দেহে পানি জমা হয়, স্বাভাবিক আকারের পরিবর্তন ঘটে ও কুসুম থলির (Yolk sac) রং এর পরিবর্তন ঘটে। এই রং এর পরিবর্তন উজ্জ্বল নীল হতে বাদামি হতে পারে। কখনও কখনও কুসুম থলিতে সাদা দাগ দেখা যায়। এই রোগে লার্ভার মজুদে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে যদিও এ রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে পানিতে ভারী ধাতুর আয়ন এর অধিক ঘনত্ব, দ্রবীভূত এ্যামোনিয়ার উচ্চহার ও পরিসফুটন ট্রে (Hatching tray) তে কাঁকর এর পরিমাণ হ্রাস পেলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। সুস্থ ও সবল প্রজননক্ষম মাছ ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ কারিগরি জ্ঞানের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে এই রোগের প্রকোপ হ্রাস করা যায়।

রক্তাল্পতা

মাছের দেহে রক্তাল্পতা নানা কারণে ঘটে থাকে। এর মধ্যে রোগ জীবাণুর আক্রমণ ও পুষ্টিহীনতা প্রধান। রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে পরিমিত পরিমাণ খাদ্য প্রয়োগ করে পারিবেশিক অবস্থা ঠিক রাখলে এ ধরনের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং মাছের দ্রুত বর্ধন সম্ভব হয়।

রক্তে লোহিত রক্ত কণিকা (Erythrocyte) ও হিমোগ্লোবিনের (Haemoglobin) মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কমে গেলে মাছের দেহে এনিমিয়া (Anemia) বা রক্তাল্পতা দেখা দেয়। রক্তাল্পতা দেখা দিলে মাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, মাছ দুর্বল ভাবে চলাফেরা করে, মাছের দেহে হরমোন ও বিভিন্ন এনজাইম এর নিঃসরণ হ্রাস পায়। সর্বোপরি মাছের ওজন হ্রাস পায়। নিম্নলিখিত কারণে মাছের দেহে রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে -

১) রক্তে আয়রন এর পরিমাণ হ্রাস পেলে,
২) মাছের খাদ্যে পুষ্টির পরিমাণ হ্রাস পেলে,
৩। মাছের খাদ্যে বিভিন্ন ভিটামিন (যেমন- ভিটামিন B_6)ও মিনারেলের পরিমাণ হ্রাস পেলে;
৪) আঘাত জনিত কারণে মাছের রক্ত ক্ষরন হলে,
৫) ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ, যেমন - হেমোরেজিক সেপটিমিয়া হলে,
৬) পরজীবীর আক্রমণ যেমন- আরগুলাস (Fish louse),
৭) ট্রিমাটোড (Trimatode) ও সেসটোড (Cestode) জাতীয় কৃমির আক্রমণ,
৮) পানিতে ভারী ধাতুজনিত দূষণ (Lead foxicity) এর কারণে,
৯) কিডনী ও যকৃতের কার্যকারিতা দীর্ঘ মেয়াদে হ্রাস পেলে।

মাছের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণে সৃষ্টি দীর্ঘ মেয়াদী রক্তাল্পতাজনিত রোগে উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পায়, মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। মাছের রক্তাল্পতাজনিত সমস্যা প্রতিকারের জন্য খাদ্যে ভিটামিন (বিশেষত: B_6), মিনারেল (বিশেষতঃ আয়রন) যোগ করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের পরজীবীর আক্রমণ রোধ করতে হবে। পারিবেশিক দূষণ প্রতিরোধ করে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। পরিশেষে বলা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, পুষ্টিকর খাবার ও বিজ্ঞান সম্মত কারিগরি জ্ঞানের দক্ষ ব্যবহার করে এই সকল সমস্যার প্রতিকার করা সম্ভব।

থাইরয়েড টিউমার

দু'টো প্রধান কারণে মাছের থাইরয়েড গ্রন্থি সংলগ্ন অঞ্চলে টিউমার দেখা দেয়- একটি আয়োডিনের অভাব অপরটি ভিটামিন B_5 এর অভাব. উভয় ক্ষেত্রেই মাছের খাদ্যের সহিত সকল উপাদান প্রয়োগ করলে আরোগ্য লাভ করে।

টিউমার বা নিওপ্লাসিয়া (Neoplasia) হল কোন কলা (Tissue) বা কোষ গুচ্ছের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এই ধরনের কোষের সাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজনের ফলে কোষের পুন: পুন: বৃদ্ধিই টিউমার গঠনের প্রধান কারণ। টিউমারকে প্রধানতঃ বেনাইন (Benign) ও ম্যালিগন্যান্ট (Malignant) এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। গ্রন্থির বেনাইন টিউমারকে কোন কোন ক্ষেত্রে এডিনোমা ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমারকে এডিনোকার্সিনোমা বলা হয়ে থাকে। থাইরয়েড টিউমার (এডিনোমা ও এডিনোকার্সিনোমা) সাধারণতঃ স্বাদু পানির মাছে দেখা যায় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মাছেও এই রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে। থাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া (Goiter) ও প্রকৃত নিওপ্লাসিয়ার মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কঠিন। মাছের থাইরয়েড ফলিকল (Folicle) গুলো ঢাকনা বিহীন (Non encapsulated) এবং বহি: থাইরয়েড টিস্যুগুলো বিভিন্ন অঙ্গে দেখা যায়। থাইরয়েড টিউমারের ফলে থাইরয়েড ফলিকলগুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে হালকা গোলাপী রং ধারণ করে। থাইরয়েডের এই বৃদ্ধি শ্বসন অঞ্চলের পৃষ্ঠীয় দেশে দেখা যায়, যা গিল আর্চ (Gill arch) সমূহ ভেদ করে অপারকুলামের বাইরেও চলে আসতে পারে। এরা কলয়ডীয় বা অকলয়ডীয় অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে ফলিকল তৈরি করতে পারে যা সূতার মতন গঠন তৈরি করে এবং অবিভক্ত এ্যানাপ্লাষ্টিক (Anaplatic) কোষ এর গুচ্ছ তৈরি করে চতুপার্শ্বের টিস্যু সমূহকে ভেদ করে। সাধারণত: খাদ্যে অজৈব আয়োডিনের পরিমাণ কম বা অভাব এর ফলে থাইরয়েড টিউমার হয়ে থাকে তবে বংশানুক্রমিকভাবেও এই রোগ হতে পারে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে থাইরয়েড টিউমার গঠনের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। খাদ্যে আয়োডিন যোগ করে অথবা এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে এই রোগের প্রকোপ কমান যায়। সোডিয়াম আয়োডাইট (Nai) অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl) এর সাথে আয়োডিন (I_2) মাছের খাদ্যে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিটামিন B_5 বা প্যান্টোথেনিক এসিড (Pantothenic Acid) এর অভাবে মাছে থাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া (Thyroid hyperplasia) নামক টিউমার গলায় দেখা দেয়, এতে মাছ শ্বাসকষ্ট পায়। মাছকে খাদ্যের সাথে এই ভিটামিন মিশ্রিতকরে খাওয়ালে আরোগ্য লাভ করে।

চক্ষু প্রসারণ রোগ

চক্ষু প্রসারণ রোগ নানা কারণে হয়ে থাকে তার মধ্যে রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে ঐ সকল রোগের প্রভাবে চক্ষু প্রসারিত হয়। কোন কোন পরজীবীর সরাসরি আক্রমণে এ রোগ হয়- আবার ভিটামিন "A" এর অভাবে এ রোগ হয়ে থাকে।

মাছের চক্ষু প্রসারণ রোগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- এক্সোপথালমিয়া (Expothalmia), চোখ ফুলা রোগ (Pop-eye), চক্ষু প্রসারিত রোগ (Potroted disease)। বিভিন্ন কারণে এই রোগ হতে পারে, যেমন- ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণের ফলে, পরজীবীর আক্রমণের ফলে ও ভিটামিনের অভাবজনিত কারণে। নানা ধরনের ভাইরাসের কারণে মাছে চক্ষু প্রসারণ রোগ হতে পারে। এই সকল ভাইরাসের মধ্যে Channel Catfish Virus (CCV) এবং Spring Viraemia of carp Virus (SVCV) কার্প জাতীয় মাছে এধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এই সকল ভাইরাস আক্রান্ত মাছের চোখ ফুলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় চক্ষু কোটর থেকে বাহিরে বেরিয়ে এসেছে। CCV জনিত চক্ষু প্রসারণ রোগ এর চিকিৎসার জন্য CCV ভাইরাস দিয়ে তৈরি ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাকটেরিয়াল সেপটিসিমিয়া রোগ হলেও এ রোগের সম্ভাবনা থাকে তখন এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ খুবই উপযোগী (পাঠ ৪.২ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে)। এছাড়া দূষণমুক্ত পরিবেশ ও দক্ষ স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগের প্রকোপ কমানো যায়। কিছু কিছু প্রটোজোয়ান পরজীবীর আক্রমণেও চক্ষু প্রসারণ রোগ মাছে দেখা দিতে পারে। এই সকল পরজীবীর মধ্যে *Myxosoma hoffmoni* স্বাদু পানিরমাছে অধিক হারে আক্রমণ করে। আবার অনেক ধরনের Eye-fluke যেমন *Diplostomum spathaceum* চক্ষু প্রসারণ রোগের অন্যতম কারণ। এই সকল পরজীবীর আক্রমণে চোখ অস্বাভাবিকভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে ও ফোলা অবস্থায় থাকে। সহ্য করা সময় পর্যন্ত লবণ (Nacl) পানির দ্রবণে (১.২%) অসুস্থ মাছকে গোছল করালে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ১৫ ppm ফরমালিন অথবা ৫ ppm $KMno_4$ দ্রবণে সহ্য করতে পারে এমন সময় পর্যন্ত গোছল করান যেতে পারে। রেটিনল (Retinol) বা ভিটামিন "A" এর অভাবজনিত কারণে

মিউকাস নি:সরণকারী এপিথেলিয়াল কলা (Tissue) গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে মাছের চোখে প্রদাহ ও চক্ষু প্রসারণ রোগ হতে পারে। ভিটামিন A -এর উৎস যে ß-ক্যারোটিনয়েড এর অভাবে চোখের নরম তন্তু ও কলায় (Soft tissue) প্রদাহ দেখা দিতে পারে যার ফলে মাছের চোখ ফুলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। ভিটামিনের অভাবজনিত চক্ষু প্রসারণ রোগের চিকিৎসার জন্য মাছের খাদ্যে ভিটামিন A যোগ করে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *নীলাভ দাগ রোগ, রক্তাল্পতা, থাইরয়েড টিউমার ও চক্ষু প্রসারণ রোগে প্রতিকার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন।*

সারমর্ম ঃ মাছের লার্ভা নীলাভ দাগ রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগে লার্ভার দেহে পানি জমা হয় ও কুসুম থলির রং পরিবর্তিত হয়ে উজ্জ্বল নীল বা বাদামি হতে পারে। সুস্থ, সবল প্রজননক্ষম মাছ ব্যবহার ও দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা এই রোগের ঝুঁকি কমায়। থাইরয়েড টিউমারের প্রধান কারণ হলো খাদ্যে আয়োডিন ও ভিটামিন B_5এর অভাব। থাইরয়েড টিউমারের ফলে থাইরয়েড ফলিকল গুলো ফুলে যায় ও গোলাপী রং ধারণ করে এবং গিল আর্চ ভেদ করে অপারকুলামের বাইরে চলে আসে। খাদ্যে সোডিয়াম আয়োডাইড (NaI) বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে আয়োডিন (I_2) এবং ভিটামিন B_5 যোগ করে মাছকে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। রক্তে লোহিত রক্ত কণিকাও হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গেলে মাছের দেহে রক্তাল্পতা দেখা যায়। সাধারণত আয়রন (Fe) ও ভিটামিন (B_5) এর কারণে রক্তাল্পতা দেখা যায়। খাদ্যে Fe সমৃদ্ধ খাবার ও ভিটামিন B_6 ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া বা পরজীবীর আক্রমণে অথবা ভিটামিন A- এর অভাবজনিত কারণে চক্ষু প্রসারণ রোগ হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ভিটামিন প্রয়োগ করে এবং রোগ জীবাণুর চিকিৎসা করলে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন

ক) নীলাভ দাগ রোগ কোন্ বয়সে মাছে দেখা দেয়?
- i) নিষিক্ত ডিম
- ii) তরুন মাছ
- iii) লার্ভা
- iv) পরিপক্ক মাছ

খ) মাছের দেহে রক্তাল্পতার প্রধান কারণ কি?
- i) কপার এর অভাব
- ii) লৌহের অভাব
- iii) সীসার অভাব
- iv) দস্তার অভাব

২। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।

ক) ভিটামিন- বি মাছের চক্ষু প্রসারণ রোগ প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়।

খ) সোডিয়ামের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমার হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) রক্তাল্পতা দেখা দিলে মাছের ---------- হ্রাস পায়।

খ) কলা বা কোষ গুচ্ছের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ---------- বলে।

পাঠ ৬.৩ ইয়োক স্যাক রোগ ও ডিম রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইয়োক স্যাক রোগ ও এর প্রতিকার সমন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- মাছের ডিম রোগ ও এর প্রতিকার সমন্ধে লিখতে ও বলতে পারবেন।

ইয়োক স্যাক রোগ (Yolk Sac Disease)

নিষিক্ত ডিম থেকে পরিস্ফুটনের (Hatch out) পর যে লার্ভা বের হয় তার কুসুম থলিতে যে সকল অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয় তাকে ইয়োক স্যাক রোগ বলে। মাছের লার্ভা বা রেণু পোনা বিভিন্ন রোগ বালাই এর প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল (Sensitive)। রেণু পোণার আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা কার্যক্রম (Defence mechanism) নাজুক হবার কারণে এরা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। ইয়োক স্যাক রোগ বা কুসুম থলির রোগ এগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই রোগে কুসুম থলির স্বাভাবিক রং এর পরিবর্তন ঘটে বাদামী বর্ণ ধারণ করে ও কখনও কখনও কুসুম থলিতে সাদা দাগ দেখা যায়। এই রোগে নার্সারির লার্ভার মজুদে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ মজুদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অসম্পূর্ণ পরিপক্ক রোগাক্রান্ত মাছ হতে ডিম সংগ্রহের ফলে এই রোগ এর প্রকোপ বেশি হচ্ছে, যদিও এই রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে পানিতে ভারী ধাতুর (Heavy metal) আয়রনের অধিক ঘনত্ব জনিত দূষণ, দ্রবীভূত এ্যামোনিয়ার উচ্চহার ও হ্যাচারীর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। রেণু পোনাগুলোকে স্থানান্তরের সময় এদের যান্ত্রিক ক্ষত (Mechanical injury) হতে পারে। নিষিক্ত ডিমগুলো পরিস্ফুটন ট্যাংকে পরিস্ফুটনের সময় বায়ু সঞ্চালন (Aeration) বেশি হলে অনেক সময় কুসুম থলিতে বা লার্ভার মুখে Gas bubble দেখা দিতে পারে। এই সময় সতর্কতার সাথে বায়ু সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন পারিবেশিক পীড়ণের (Environmental stress) কারণে কুসুম থলির রোগ হতে পারে। সুস্থ্য, সবল ও পরিপক্ক প্রজননক্ষম মাছের ব্যবহার এই রোগের সম্ভাবনা কমাতে পারে। নিষিক্ত ডিম গুলোকে অক্সি টেট্রাসাইক্লিন মেশানো পানিতে ধৌত করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। পরিচ্ছন্ন দূষণমুক্ত হ্যাচারি পরিবেশ ও যথাযথ কারিগরী জ্ঞানের দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে পারে।

নিষিক্ত ডিম থেকে পরিস্ফুটনের পর যে লার্ভা বের হয় তার কুসুম থলিতে অস্বাভাবিক অবস্থাই হল ইয়োক স্যাক রোগ। বায়ু সঞ্চালন, পারিবেশিক পীড়ণ, ও পরিচর্যার ত্রুটির কারণে এ রোগ দেখা দেয় এবং রেণু পোনা অধিক হারে মারা যেতে পারে।

ডিম রোগ

মাছের ডিম সমূহ বিভিন্ন রোগের প্রতি সংবেদনশীল। প্রজননকৃত মাছগুলো দীর্ঘ মেয়াদী অপুষ্টি, রক্তাল্পতা (Anemia), দুর্বল এমনকি অসম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় প্রজনন করলে ডিমগুলোও অধিকতর নাজুক (Delicate) অবস্থায় থাকে। রোগাক্রান্ত মাছের ডিমেও রোগের সংক্রমন হতে পারে, সংক্রমিত ডিমগুলো সফলভাবে পরিস্ফুটন করান যায়না। হ্যাচারিতে পারিবেশিক অপরিচ্ছন্নতার জন্য ডিমে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ দেখা দেয়, এর মধ্যে ডিমে ছত্রাক (Fungus) এর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি। আক্রান্ত ডিমগুলো সাদাটে রং ধারণ করে এবং ডিমের মধ্যকার কোষের মাইটোসিস বিভাজন স্থবির এমনকি বন্ধ হয়ে যায়। ডিমে ছত্রাকের এই আক্রমণ তখনই বোঝা যায় যখন ডিমের অধিকাংশই ছত্রাক আক্রমণের শিকার হয়ে যায়। ছত্রাকের এ আক্রমণ খুব তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করে এবং ২-৩ দিনের মধ্যেই সমস্ত ডিম নষ্ট হয়ে যায়। ছত্রাকজনিত ডিম রোগের প্রতিকারের জন্য সদ্য নিষিক্ত ডিমগুলোকে ১ : ৫০০,০০০ অনুপাতের Diquat দ্রবণ দ্বারা ধৌত করা যেতে পারে, অন্যথায় Phenoxethol দ্রবণ ব্যবহার করা চলে। মিথিলীন ব্লুর ০.১-০.১৫ ppm দ্রবণও ডিম ধৌত করণে বিশেষ ফলদায়ক। সর্বোপরি হ্যাচারির পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ ডিম রোগের প্রকোপ কমাতে পারে।

ছত্রাক জাতীয় রোগ জীবাণুর আক্রমণে নিষিক্ত ডিম হঠাৎ সাদাটে বর্ণ ধারণ করে এবং এদের পরিস্ফুটন হয়না। মিথিলিন ব্লুর ০.১-০.১৫ পি.পি.এম. দ্রবণে ধৌত করালে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়।

***অনুশীলন (Activity) ঃ** মাছের ইয়োক স্যাক রোগ, ডিম রোগ ও এদের প্রতিকার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন।*

সারমর্মঃ ইয়োক স্যাক রোগে কুসুম থলির স্বাভাবিক রং এর পরিবর্তন হয়ে বাদামি রং ধারণ করে ও কখনও কখনও কুসুম থলিতে সাদা দাগ দেখা দেয়। ইয়োক স্যাক রোগ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দূষণ ও অণুজীব মুক্ত পরিবেশ। তবে নিষিক্ত ডিমগুলোকে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন মেশান পানি দ্বারা ধৌত করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। দূষণমুক্ত হ্যাচারিতে কারিগরী জ্ঞানের দক্ষ ব্যবহার এ রোগের প্রাদুর্ভাব বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। মাছের ডিমসমূহ বিভিন্ন রোগ জীবাণুর প্রতি সংবেদনশীল। হ্যাচারিতে অপরিচ্ছন্নতার জন্যে ডিমে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রকোপ দেখা যায়। ছত্রাক আক্রান্ত ডিম রোগে ডিমগুলো সাদাটে বর্ণ ধারণ করে এবং ছত্রাক আক্রমণের ২/৩ দিনের মধ্যে সব ডিম নষ্ট হয়ে যায়। ডিম রোগের প্রতিকারের জন্য সুস্থ সবল ব্রুড মাছ নির্বাচনের পাশাপাশি হ্যাচারির পরিবেশও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ছত্রাকজনিত ডিম রোগ প্রতিরোধের জন্য Diquat, Phenoxethol অথবা Methylene blue এর যে কোনটির দ্রবণে সদ্য নিষিক্ত ডিমগুলোকে ধৌত করে নিতে হবে। সর্বোপরি স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশে ডিম ও পোনার লালন এই সব রোগজনিত ঝুঁকি কমায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক) ইউক স্যাক রোগে মাছের লার্ভার রং পরিবর্তিত হয়ে কোন্ রং ধারণ করে?

i) লাল
ii) উজ্জল নীল
iii) কাল
iv) সবুজ

খ) ইউক স্যাক রোগ কোন্ বয়সের মাছ ঘটে?

i) নিষিক্ত ডিম
ii) তরুন মাছ
iii) লার্ভা
iv) পরিপক্ক মাছ

২। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।

ক) ছত্রাক ডিম রোগের প্রধান কারণ।
খ) ২০-২৫ পি. পি. এম. মিথিলিন ব্লু দ্রবণ ডিম রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) ইয়োক স্যাক রোগে কুসুম কলির রং পরিবর্তিত হয়ে ---------- বর্ণ ধারণ করে।
খ) ডিম রোগে আক্রান্ত ডিমের মধ্যকার কোষের বিভাজন ---------- স্থবির হয়ে যায়।

পাঠ ৬.৪ আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গের রোগ সমন্ধে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির রোগগুলোর নিয়ন্ত্রণের উপায় সমন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।

মাছের শরীরের উপরের অংশ, মস্তক, ফুলকা, পাখনা, আঁইশ ইত্যাদি ছাড়া অভ্যন্তরের সকল অঙ্গই সাধারণত আভ্যন্তরীণ অঙ্গ হিসেবে পরিচিত। অন্যান্য বড় বড় প্রাণী বা মানুষের মত আভ্যন্তরীণ অঙ্গের রোগ মাছে ততবেশী সুনির্দিষ্ট নয়। রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত, পুষ্টিজনিত বা পীড়ণের মাধ্যমে মাছের আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এছাড়া শরীরতাত্ত্বিক অস্বাভাবিক কার্য্যকলাপে নানা ধরনের রোগের লক্ষণ মাছের আভ্যন্তরীণ অঙ্গে প্রকাশ পায়। নিম্নে এসকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সাধারণ রোগ সমন্ধে আলোচনা করা হলো।

মাছের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সুনির্দিষ্ট রোগের সংখ্যা অন্যান্য বড় বড় প্রাণীর তুলনায় কম। বডি ক্যাভিটি, লিভার, কিডনী ইত্যাদি অঙ্গে কিছু কিছু রোগ উল্লেখযোগ্য।

বডি ক্যাভিটির রোগ (Disease of Bodycavity)

মাছের পেট বরাবর অভ্যন্তরে যে বিরাট গহ্বর রয়েছে তা সরাসরি অঙ্গ হিসেবে না ধরলেও সকল গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ অঙ্গ এর মধ্যেই অবস্থিত। বিভিন্ন অঙ্গের রোগের প্রভাবে এই গহ্বরে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন- ড্রপসি রোগের কারণে এই গহ্বরেই পানি জমে তা ফুলে যায় অথচ তার কারণ ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা অন্যকোন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কিডনী বা অন্য কোন অঙ্গের অস্বাভাবিক কার্য্যকারীতার ফল। বডি ক্যাভিটির প্রাচীরে অনেক সময় ক্ষত দেখা যায় আবার পরজীবীর সিস্ট থেকে মাছে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করে। আক্ত পরজীবীর আক্রমণ বন্ধ করা সরাসরি বেশ কঠিন- পরোক্ষভাবে পরজীবীগুলোর অন্য মাধ্যমিক পোষক যেমন- শামুক পুকুর থেকে অবাঞ্ছিত প্রাণী হিসেবে উঠিয়ে ফেললে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া ব্যাক্টেরিয়া বা অন্য কোন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত বুঝা গেলে তা পাঠ ৪.২ অনুযায়ী প্রতিকার করা যেতে পারে। আর ক্ষত রোগ দেখা দিলে তা পাঠ ৪.৩ অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

লিভারের রোগ (Disease of Liver)

লিভার বা যকৃত সবচেয়ে বড় গ্রন্থি, পরজীবীর আক্রমণ এখানে খুবই সাধারণভাবে ব্যাকটে-রিয়া বা ভাইরাস দ্বারা মাছ আক্রান্ত হলে তা লিভারেও দেখা দিতে পারে। লিভার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে সিরোসিস দেখা দিতে পারে।

যকৃত বা লিভার মাছের রোগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটা সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। বিভিন্ন পাচক রস উৎপন্ন করা থেকে শুরু করে নানাবিধ শরীরতাত্ত্বিক কার্য্য সম্পাদন করে থাকে এই লিভার। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার রোগজীবাণুর আক্রমণ ও পরিমিত পুষ্টির অভাবজনিত কারণে লিভারের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে যায় এবং তার বহি:প্রকাশ হিসেবে মাছের খাদ্যে অনীহা আসে, দুর্বলতা দেখা দেয়,জন্ডিস বা অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পায়। চাইনিজ লিভার ফ্লুক (Chinese Liver Fluke, *Clonorchis chinensis*) কেবলমাত্র স্বাদু পানির মাছের লিভারে আক্রমণ করে। এতে লিভার নষ্ট হয়ে যায়, এবং এর কার্য্যকারিতা হারিয়ে বিভিন্ন রোগের লক্ষন প্রকাশ পায়। উল্লিখিত পরজীবী ছাড়াও মাছের লিভারে আরও অন্যান্য হেলমিন্থস (Helminths) গ্রুপের পরজীবীর আক্রমণ হয়। এসকল রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রন করার জন্য তেমন কোন ভাল ঔষধ নেই- তবে পরজীবীগুলো শনাক্ত করে তার মাধ্যমিক পোষক বা বাহক পোষক (Carrier Host) এর মাধ্যমে বিস্তার লাভ যাতে না করে তার জন্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। পরজীবী ছাড়াও সেপটিসেমিয়া জাতীয় রোগ ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা হলে তার ফলে লিভার ক্ষতিগ্রস্থ হয় - এমন কি লিভার সিরোসিস (Cirrhosis) হয়ে যায়। ভাইরাসের আক্রমণের জন্য তেমন কোন প্রতিকার নেই। তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে যাতে ঐ

রোগের বিস্তার না ঘটে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর ব্যাকটেরিয়া রোগ জীবাণু হিসেবে শনাক্ত করতে পারলে পাঠ ৪.২ অনুযায়ী তার প্রতিকার করা যেতে পারে।

হৃদপিন্ডের রোগ (Disease of heart)

অনেক সামুদ্রিক মাছে টিউবারকুলোসিস রোগ বা অনুরূপ রোগ হতে দেখা গিয়েছে। *Mycobacterium* sp ও *Nocardia* sp নামক ব্যাকটেরিয়া এজন্য দায়ী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এধরনের রোগের ফলে মাছের হৃদপিন্ড আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতেপারে। চাষকৃত খাঁচায় মাছের খাদ্যের সঙ্গে এন্টিবায়োটিক পাঠ ৪.২ অনুযায়ী প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

কিডনীর রোগ (Disease of Kidney)

কিডনীতে সেপ্টিসেমিক রোগ হলেই তার প্রভাব পড়ে এবং নানা রকম উপসর্গ প্রকাশ করে। ব্যাকটেরিয়াল কিডনী রোগ এর একটি মারাত্মক রোগ।

আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির মধ্যে কিডনী একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা শারীরতাত্ত্বিক কার্যকলাপ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) জাগানো-বিশেষ করে এন্টিবডি তৈরির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এমন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রোগজীবাণুর আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে নানা রকম রোগের লক্ষন প্রকাশ করে। বিশেষ করে সকল প্রকার সেপ্টিসেমিক রোগে কিডনী আক্রান্ত হয়ে যায় - যা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া উভয় প্রকার রোগজীবাণুর মাধ্যমেই ঘটে থাকে। ফলে কিডনী তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় ঘা দেখা দিতে পারে, ড্রপসি দেখা দেয়, মাছের মৃত্যু ঘটে। কিডনীর একটি বিশেষ রোগের নাম "ব্যাকটেরিয়াল কিডনী রোগ" (Bacterial Kidney Disease, সংক্ষেপে B.K.D) যা সাধারণত সামুদ্রিক স্যামন (Salmon) জাতীয় মাছে হতে দেখা যায়। আমোদের দেশে ইলিশ মাছের এ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে - তবে গবেষণার দ্বারা এখনও তা জানা যায়নি। রোগ উৎপন্নকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম, *Renibacterium salmoninarum*। একে প্রাথমিক পর্যায়ে মাছে শনাক্ত করা কঠিন এবং সে কারণে এ রোগের চিকিৎসাও খুব জটিল। সময় উপযোগী ঔষধ প্রয়োগ না করলে চাষকৃত মাছ বিশেষ করে খাঁচায় চাষকৃত মাছের খুব ক্ষতি হয়- মৃত্যুর হার খুব বেশি। পাঠ ৪.২ এ বর্নিত এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে বিশেষ করে খাবারের সহিত মিশিয়ে এরোগ প্রতিকার করা যেতে পারে। এককোষী পরজীবী, *Myxobolus* sp কার্প জাতীয় বিশেষ করে Gold Fish এর কিডনীতে আক্রমণ করতে দেখা গেছে, ফলে পেটে পানি জমে ড্রপসি রোগ লক্ষণ প্রকাশ করে। এর তেমন কোন প্রতিকার করা যায় না। তবে রোগাক্রান্ত মাছ গুলো চিহ্নিত করার পর পুকুর বা একোরিয়াম থেকে আলাদা করে ২০-২৫ পিপিএম ফরমালিন দ্রবণে সহ্য করা সময় পর্যন্ত গোসল করানো যেতে পারে।

অগ্ন্যাশয়ের রোগ (Disease of Pancreas)

অগ্ন্যাশয়ের একটি বিশেষ রোগ হল IPNযা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। অগ্নাশয়ের কার্য্য-কারিতা বন্ধ হয়, নেক্রো-সিস দেখা দেয় এবং মাছ মারা যায়।

অগ্ন্যাশয় (Pancraeas)ও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আসলে এটা একটি অন্যতম প্রধান গ্রন্থি যা থেকে পাচক রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাকে অংশ গ্রহণ করে। ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। নাতিশীতোষ্ণ বা শীত প্রধান দেশে ভাইরাসজনিত একটি অতি সাধারণ রোগ স্যামন (Salmon)সহ অন্যান্য মাছের অগ্ন্যাশয়ে আক্রমণ করে। রোগটির নাম আই.পি.এন (IPN-Infectious Pancreatic Necrosis) যা *IPNV (Infectous Pancreatic Necrosis Virus)* দ্বারা সৃষ্ট হয়। এটা একটি মারাত্মক রোগ এবং খুব সহজেই সংক্রমিত হয়ে সকল চাষকৃত অথবা সকল মজুত মাছের মৃত্যু ঘটাতে পারে। এরোগের ফলে অগ্নাশয়ে নেক্রোসিস (Necrosis) ঘটে এবং স্বাভাবিক কার্য্যকলাপ বন্ধ হয়ে গ্রন্থির অকর্মন্যতা দেখা দেয়। এতে নানা রকম রোগের লক্ষন প্রকাশ পায় - মাছ খাবার বন্ধ করে দেয়, মৃত্যু ঘটে যায়। ভাইরাসজনিত রোগের প্রতিকার করা

খুবই কঠিন - যা হউক একে প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংক্রমণ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য গ্রন্থির কার্যহীনতা (Disfunction of other Glands)

গ্রন্থি সমূহের কার্য্যকারিতা সাধারণত শারীরতাত্ত্বিক। সে জন্য যদি কোন গ্রন্থির কোন কারণে কার্যহীনতা দেখা দেয় তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই গ্রন্থির নির্দিষ্ট কাজ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে নানাভাবে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পুষ্টিহীনতা, পারিবেশিক পীড়ণ এবং রোগজীবাণুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে এই রোগ দেখা দেয়।

পিটুইটারী গ্রন্থির (Pituitary Gland) কার্যহীনতা

মাছের শরীরতাত্ত্বিক ভারসাম্যতা লোপ পায়, অন্যান্য গ্রন্থির নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এটা একটি নালীবিহীন গ্রন্থি (Endocrine Gland) কিন্তু এর প্রাধান্য রয়েছে সকল Endocrine Gland এর ওপর। মাছ চাষে সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থাপনার দ্বারা এ গ্রন্থির কার্যকারিতা ঠিক রাখা সম্ভব।

থাইরয়েড গ্রন্থির (Thyroid Gland) কার্যহীনতা

গ্রন্থির কার্যহীনতা হলে নানা উপসর্গ প্রকাশ পায়। পিটুইটারী গ্রন্থির কার্যহীনতা হলে দেহের ভারসাম্য লোপ পায়, থাইরয়েড গ্রন্থির কারণে থাইরয়েড হাইপার-প্লেসিয়া এবং যৌনাঙ্গের কার্য-হীনতার কারণে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।

থাইরয়েড গ্রন্থিও একটি অন্যতম প্রধান নালীবিহীন গ্রন্থি (Endocrine Gland)। বিভিন্ন কারণে এর কার্যহীনতা দেখা দিলে গ্রন্থির নি:সরণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মাছের গলা ফুলে যায় এবং ভিতরের দিকে টিউমার দেখা দেয় তখন মাছ শ্বাস কষ্টে ভোগে। এ অবস্থাকে থাইরয়েড হাইপারপ্লেসিয়া (Thyroid Hyperplasia) বলে। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হলো মাছের শরীরে আয়োডিনের অভাব। এছাড়াও রোগজীবাণুর আক্রমণ বা ভিটামিনের অভাব (Pantothenic Acid) হলেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। উল্লিখিত কারণের জন্য মাছেকে আয়োডিন বা প্যান্টোথেনিক এসিড মিশ্রিত খাবার দিলে আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করে।

যৌন গ্রন্থির কার্যহীনতা (Disfucntion of sex Gland)

যৌনাঙ্গ বলতে পুরুষ মাছের জন্য শুক্রাশয় (Testes) আর স্ত্রী মাছের জন্য ডিম্বাশয়কে বুঝায়। সঠিকভাবে হরমোনের ক্রিয়া না হওয়ার কারণে রোগ জীবাণুর আক্রমণ, পারিবেশিক পীড়ণ বিশেষ করে দূষকের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি কারণে মাছের ডিম নিষিক্ত হতে পারেনা অথবা ডিম বা শুক্রানু পরিপক্ক হতে পারেনা অথবা বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য নির্বাচিত পরিপক্ক পুরুষ ও স্ত্রী মাছের যত্ন আলাদাভাবে করতে হবে। এদেরকে ব্রুড ফিশ (Brood fish) বলা হয়। এদের সর্ব প্রকার রোগ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষভাবে পরিচর্যার ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক সময় ঔষধ প্রয়োগের দ্বারাও ডিমের ক্ষতি হতে পারে - তাই উত্তম ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিচর্যা করাই ভাল।

টিউমার (Tunour)

নানা রকম শরীরতাত্ত্বিক কারণ, কোষ ও কলার প্রতিক্রিয়া, রোগজীবাণুর আক্রমণে মাছের আভ্যন্তরীণ যে কোন অঙ্গেই কোষ ও কলার অস্বাভাবিক বর্ধন এবং কলাগুচ্ছের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ: তা বেড়ে ফুলে যায় - এ অবস্থাকে সহজ ভাষায় টিউমার বলা হয় - তবে এর অন্যান্য নামও রয়েছে যেমন- নিউপ্লেসিয়া (Neoplasia)। সাধারণত ক্ষতিকারক নয় (Benign) ও ক্ষতিকারক (Mailgnant) এই দু'ধরনের টিউমার মাছের আভ্যন্তরীণ অঙ্গে দেখা দেয়। উদাহরণ হিসেব Benign Tumour-

টেরাটোমাস (Terratomas) এবং Malignant Tumour-হিসেবে কারসিনোমাস (Carcinomas) উল্লেখ করা যায়। এদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

অনুশীলন (Activity)ঃ *মাছের আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির রোগ সমন্ধে আলোচনা করুন। এসকল রোগসমূহের নিয়ন্ত্রণ করার উপায়গুলো লিখুন।*

সারমর্ম ঃ মাছে আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির রোগ অন্যান্য বড় বড় প্রাণীর ন্যায় ততটা সুনির্দিষ্ট নয়। তথাপিও রোগজীবাণুর আক্রমণ, পরিবেশজনিত কারণ, শরীরতাত্ত্বিক এবং পুষ্টিজনিত কারণে কোন কোন আভ্যন্তরীণ অঙ্গ বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল। বডি ক্যাভিটির প্রাচীরে হেলমিন্থিস্ পরজীবীর সিস্ট পাওয়া যায় যেগুলো অনেক সময় ক্ষতের সৃষ্টি করে। অন্য অঙ্গের রোগের প্রভাবে এই গহ্বরে পানি জমে ড্রপসি রোগ সৃষ্টি করে। লিভারে বিভিন্ন প্রকার হেলমিন্থস্ পরজীবীর আক্রমণে লিভার সিরোসিস করে থাকে - ফলে লিভার কার্যহীনতায় ভুগে এবং শরীরে এরজন্য অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পায়। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসেরও আক্রমণ হতে পারে। এর প্রতিকার করার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া ফলদায়ক। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ সামুদ্রিক মাছের হৃদপিন্ডে, কিডনীতে হতে দেখা গিয়েছে। কিডনীতে আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম *Renibacterium salmoninarum*। ভাইরাসের আক্রমণে অগ্ন্যাশয়ের কর্মহীনতা লক্ষ্য করা গেছে। অগ্ন্যাশয়ের Necrosis করে যে ভাইরাস থাকে সংক্ষেপে IPNV বলে। নালিবিহীন গ্রন্থির মধ্যে পিটুইটারী ও থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যহীনতা উল্লেখযোগ্য - যথাক্রমে দেহের ভারসাম্য হারায় ও গলায় থাইরয়েড হাইপারপ্লেসিয় (Tumour) করে।অনেক সময় যৌনাঙ্গের কার্যহীনতার কারণে বন্ধ্যাত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এছাড় আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঙ্গে ক্ষকিকারক নয় (Benign) ও ক্ষতিকারক (Malignant) টিউমার চিহ্নিত হয়েছে - তবে এদের নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিকার করার ব্যবস্থা নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক) বডি ক্যাভিটিতে সচরাচর কোন্ রোগটি পরিলক্ষিত হয়?
- i) ক্ষত রোগ
- ii) প্যারাসাইট সিস্ট
- iii) ড্রপসি
- iv) ভাইরাস রোগ
- v) ফুটকী

খ) মাছের লিভারে সাধারণত কোন্ ধরনের পরজীবীর আক্রমণ হয়?
- i) আরগুলাস
- ii) জোঁক
- iii) প্রোটোজোয়া
- iv) হেলমিন্থস্
- v) ছত্রাক

২। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।

ক) *Renibacterium Salmoninrum* ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ব্যাকটেরিয়াল কিডনী রোগ হয়।

খ) *Clonorchis chinensis* কেবলমাত্র লোনা পানির মাছের লিভারে আক্রমণ করে।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) IPN মাছের ---------- অঙ্গের বিশেষ রোগ।

খ) পিটুইটারী গ্রন্থি একটি ---------- গ্রন্থি।

৪। এক কথায় বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক) কারসিনোমাস কী?

খ) B.K.D বলতে কী বুঝায়?

ব্যবহারিক

পাঠ ৬.৫ একটি মাছ/চিংড়ির ব্যবচ্ছেদ করে রোগাক্রান্ত অবস্থা শনাক্তকরণ

এ পাঠ শেষে আপনি-

- একটি মাছ ও একটি চিংড়ির দেহের বর্হিভাগে কোন রোগের আক্রমণ হলে তা শনাক্ত করতে পারবেন।
- রোগ আক্রান্তকরণ শনাক্তকরণের জন্য যে কোন মাছ ও চিংড়ির ব্যবচ্ছেদ করতে পারবেন এবং আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।
- আক্রান্ত মাছ ও চিংড়ির হিস্টোলোজিক্যাল নিরীক্ষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- মাছ ও চিংড়ির বহিস্থঃ ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গ থেকে ব্যাক্টেরিয়া পৃথকীকরণের জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে পারবেন।
- পরজীবী আলাদা করতে পারবেন।

কোন মাছ বা চিংড়ি রোগাক্রান্ত শনাক্তকরণের জন্য মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহের পর ভাল করে বাহ্যিক অবস্থা নিরীক্ষন করতে হয়। যদি ঘা, ক্ষত, অস্বাভাবিক বর্ণ, বা অস্বাভাবিক স্বাস্থ্য মনে হয় তা হলে তা রেকর্ড করতে হয়। এছাড়া অনেক বহি:পরজীবী শরীরের উপরের অংশে লেগে থাকে যেমন Argulus, Lernaea (মাছের ক্ষেত্রে) এবং চিংড়ির ক্ষেত্রে Cymothoa (Isopod)। যা হউক আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এদের ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে হয়। হিস্টোলোজী করে বিভিন্ন অঙ্গের কলার রোগাক্রান্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা রোগের কারণ নির্ণয়ের একটি ভাল উপায়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা ভাইরাসকে আলাদা করে এদের চিহ্নিত করা উত্তম উপায়। তবে তা জটিল, ব্যয় বহুল এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক কৃত্রিম মিডিয়ামে পৃথকীকরণ ও কালচার করা যায়- কিন্তু ভাইরাসকে Cell Line বা টিস্যুকালচার করে পরীক্ষা করা হয় যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আবার পরজীবী আলাদা করা সহজ এবং কোন মিডিয়াম ছাড়াও পরীক্ষা করা যায়। এখন একটি মাছ ও একটি চিংড়ি ব্যবচ্ছেদ করে রোগ শনাক্তকণের পদ্ধতি দেখানো ও আলোচনা করা হলো।

মাছ ও চিংড়ির রোগা-ক্রান্ত অবস্থা শনাক্তকরণের জন্য বহিঃ ও আভ্যন্তরীণ উভয় অঙ্গাদির পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এর জন্য ব্যবচ্ছেদ করে আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দেখতে হবে এবং হিস্টোলজি করে কলার অবস্থা নিরীক্ষা করতে হবে। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক কৃত্রিম মিডিয়ামে এবং ভাইরাসকে টিস্যুকালচার করে পরীক্ষা করতে হয়। পরীক্ষার জন্য তেমন কোন মিডিয়ামের প্রয়োজন হয়না।

ব্যবচ্ছেদ করার উপকরণ

মাছ বা চিংড়ির ব্যবচ্ছেদের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো নিম্নের চিত্রের সাহায্যে উল্লেখ করা হলো-

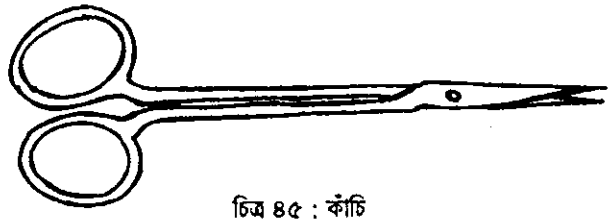

চিত্র ৪৫ : কাঁচি

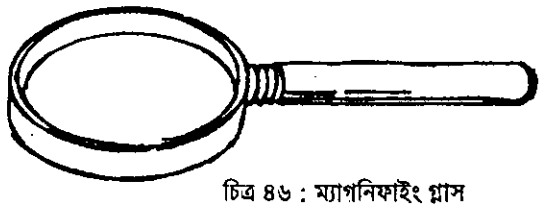

চিত্র ৪৬ : ম্যাগনিফাইং গ্লাস

চিত্র ৪৭ : স্ক্যালপেল

চিত্র ৪৮ : চিমটা

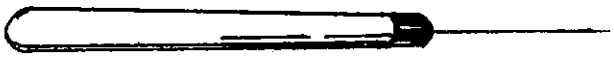

চিত্র ৪৯ : সূঁচ

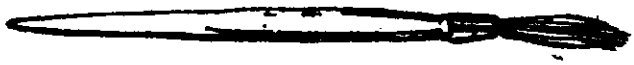

চিত্রঃ ৫০ : তুলি

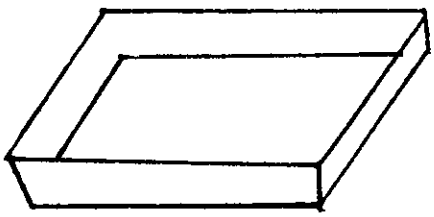

চিত্র ৫১ : ব্যবচ্ছেদ ট্রে

মাছ ও চিংড়ির বহির্ভাগ পর্যবেক্ষণ

একটি মাছের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত (চিত্র ৫২) ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মাছের পিছন ও সামনের (পেটের) দিক কোন পরজীবী বা ঘা আছে কি-না অথবা বর্ণ অস্বাভাবিক কি-না তা রেকর্ড করতে হবে। অনুরূপভাবে একটি চিংড়িরও সামনের ও পিছনের বহির্ভাগ (চিত্র ৫৫ - ৫৭) ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ক্যারাপেসে কোন দাগ বুঝা যায় কি-না তা ভাল ভাবে নিরীক্ষা করতে হবে।

প্রয়োজনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে পরজীবী বা কোন ধরনের ক্ষত আছে কি-না লক্ষ্য করে তা রেকর্ড করতে হবে।

চিত্র ৫২, ৫৩, ৫৪ ও ৫৫ এর সাহায্যে একটি মাছের বহির্ভাগ ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতি দেখানো হলো-

কাচি

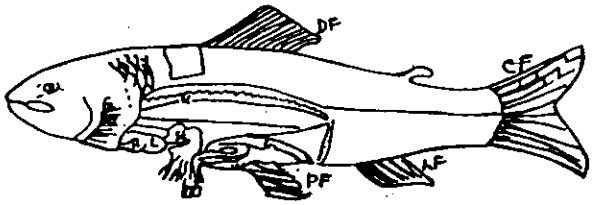

চিত্র ৫২ : একটি কার্প জাতীয় মাছের ব্যবচ্ছেদ শনাক্তকরণ করা দেখানো হচ্ছে

DF= পৃষ্ঠ পাখনা (Dorsal Fin)
CF= পুচ্ছ পাখনা (Caudal Fin)
AF= পায়ু পাখনা (Anal Fin)
H = হৃৎপিন্ড (Heart)
L = লিভার (Liver)
St= পাকস্থলী (Stomach)
PC = পাইলোরিকসিকা (Pyloric Caeca)
In= অন্ত্র (Intestine)
K = কিডনী (kidney)
G = ফুলকা (Gills)
PF= শ্রোণী পাখনা (Pectoral Fin)

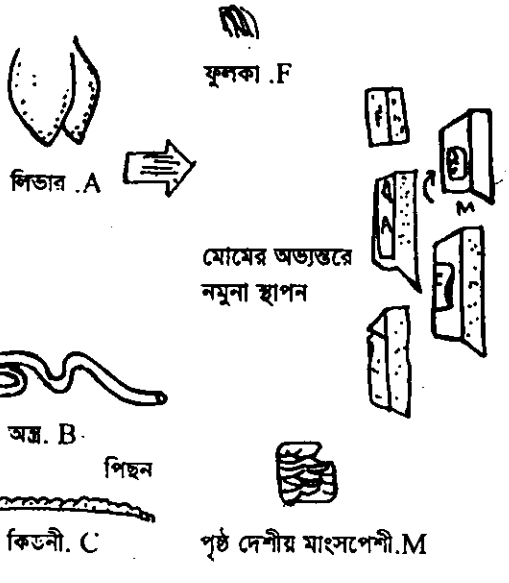

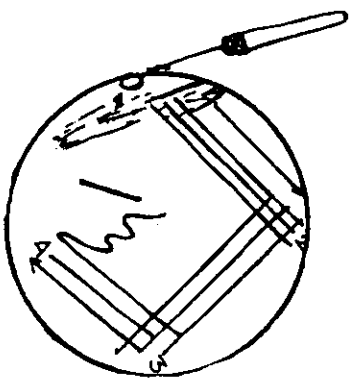

চিত্র ৫৩ : ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণের জন্য আগার প্লেটে ১-৪ টি ধাপে কালচার করার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে (ক্রম ডাইলুশন পদ্ধতিতে একই প্লেটে)

চিত্র ৫৪ : হিষ্টোলজী পদ্ধতিতে কলার রোগাক্রান্ত অবস্থা দেখার জন্য বিভিন্ন অঙ্গের নমুনা সংগ্রহ

নিম্নের চিত্রের সাহায্যে চিংড়ির রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতি দেখানো হলো-

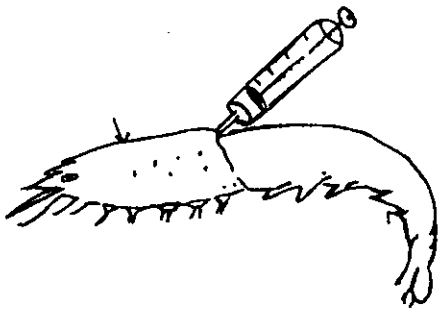

চিত্র ৫৫ : হিমোলিম্ফ (Haemolymph) সংগৃহীত হচ্ছে (হৃদপিন্ড থেকে)

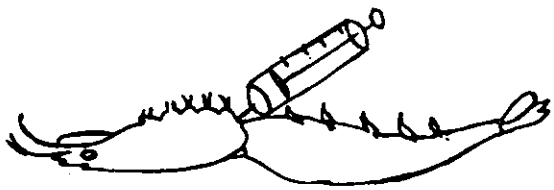

চিত্র ৫৬ : ভেন্ট্রাল সাইনাস থেকে হিমোলিম্ফ সংগ্রহ

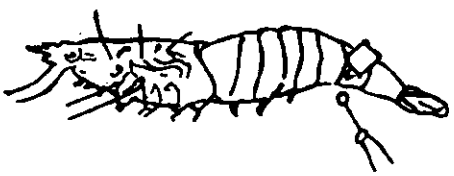

চিত্র ৫৭ : ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণের জন্য পেটের মাংস থেকে নমুনা সংগ্রহ ও গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীন অঙ্গসমূহ

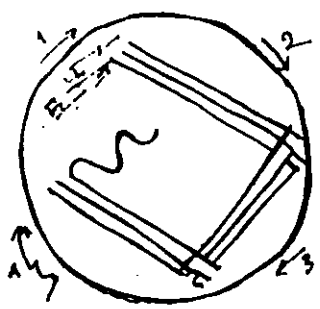

চিত্র ৫৮ : প্লেটকালচার করে ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ

চিত্র ৫৯ : হিস্টোলজী করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গে নমুনা সংগ্রহ

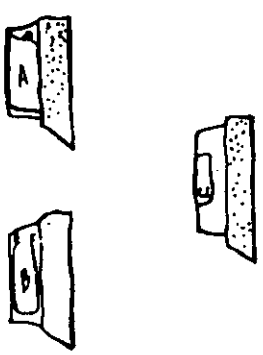

চিত্র ৬০ : টিস্যু প্রসেসর থেকে আলাদা করার পর নমুনাগুলো মোমের মধ্যে স্থাপন

মাছের ব্যবচ্ছেদকরণ ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির পর্যবেক্ষণ

বহির্ভাগ পর্যবেক্ষণের পরেই ৭০% ইথাইল অ্যালকোহলে ভিজিয়ে তুলা দ্বারা মাছের পেটের অংশ (পায়ু থেকে ফুলকার সংলগ্ন বরাবর) ভালোভাবে মুছে নিয়ে চিমটা দ্বারা ধরে কাঁচি দ্বারা ভাল ভাবে কেটে পরিষ্কার করতে হবে। যাতে সকল আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দৃশ্যমান হয়। ফুলকা দেখার জন্য উপরের কানকোয়া উঠিয়ে ফেলতে হবে। বডিক্যাভিটি ও এর অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল অঙ্গের উপরিভাগে যদি কোন পরজীবী বা রোগ লক্ষণ পাওয়া যায় তা রেকর্ড করতে হবে। তদ্রুপ ফুলকার জন্যও করতে হবে (চিত্র ৫২)।

পর্যবেক্ষণ ভালোভাবে করা অতি প্রয়োজন, তা বহির্ভাগ বা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ উভয়ই। ম্যাগনি-ফাইং গ্লাস এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর রেকর্ডও সতর্কতার সহিত করতে হবে।

চিংড়ির ব্যবচ্ছেদকরণ ও আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির পর্যবেক্ষণ

চিংড়ি যেহেতু একটি অমেরু দন্ডী প্রাণী তাই এর ব্যবচ্ছেদ পিছন দিক থেকে করা সহজ ও সঠিক। ব্যবচ্ছেদের পূর্বে অবশ্য তার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নিঃসৃত তরল (রক্ত মিশ্রিত) যার নাম হিমোলিম্ফ তা পরীক্ষার জন্য চিত্র ৫৫, ৫৬ অনুযায়ী সংগ্রহ করতে হবে। এর পর ক্যারাপেস অপসারণ করতে হবে খুব যত্নের সহিত এবং তখন গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ অঙ্গ যেমন হেপাটোপ্যাংক্রিয়াস, লিম্ফয়েড অঙ্গ, হৃদপিন্ড ইত্যাদির ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণকরে রেকর্ড করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ শনাক্তকরণের জন্য নমুনা সংগ্রহ

বহির্ভাগ ও ব্যবচ্ছেদের দ্বারা আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদি পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগাক্রান্ত অবস্থার একটি সাধারণ অবস্থা চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রকৃত রোগ জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য এদের বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে পৃথকীকরণ করে ধাপে ধাপে সুনির্দিষ্ট ভাবে শনাক্ত করতে হবে। এজন্য বিশেষ গবেষণা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণও যথেষ্ট থাকা দরকার। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকে জন্য পূর্বেই প্রস্তুতকৃত কালচার মিডিয়ামে ব্যবচ্ছেদের সময় নমুনা সংগ্রহ করতে (চিত্র ৫৩, ৫৮ অনুযায়ী) হবে। এ ব্যাপারে যাতে সংক্রমণ না হয় তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

হিস্টোলজী পদ্ধতির মাধ্যমে মাছ ও চিংড়ির রোগ শনাক্তকরণ

এ পদ্ধতির মাধ্যমে কলা ও কোষের যে পরিবর্তন হয় (রোগাক্রান্ত হলে) তা চিহ্নিত করা যায়। এমনকি ঐ সকল আক্রান্ত অঙ্গের কলাতে যদি কোন রোগ জীবাণু থাকে তা চিহ্নিত করা যায়। তবে এ পদ্ধতির জন্যও একটি সাধারণ ল্যাবরেটরী দরকার যেখানে টিস্যু কাটার ব্যবস্থা করা যায়। এজন্য একটি মাইক্রোটোম মেশিন থাকা দরকার। আর প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, মোম, রং করার প্রয়োজনীয় উপকরণও থাকা দরকার। মাছ কিংবা চিংড়ি থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্য নমুনা গ্রহনের পর পরই আক্রান্ত অঙ্গসহ অন্যান্য অঙ্গ থেকে হিস্টোলজী করার জন্য নমুনা (চিত্র ৫৪, ও ৬০) আলাদাকরে ১০% নিউট্রাল বা বাফারড্ ফরমালিন অথবা শুধু ১০% ফরমালিন দ্রবনে কমপক্ষে একঘন্টা রেখে ফিক্স করতে হয়। এরপর টিস্যুগুলো পাতলা থেকে ঘন এলকোহল দ্রবনে ডিহাইড্রেশন করে জাইলিনে পরিষ্কার করা হয়। অত:পর গলিত মোমে এদের স্থানান্তর করা হয়। এরপর ঘন মোমের মধ্যে টিস্যু গুলো আলাদা আলাদা স্থাপন করে শক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে মাইক্রোটোমের সাহায্যে অত্যন্ত পাতলা (৪-৫ μm) করে কেটে তা স্লাইডে স্থাপন করা হয়। স্লাইড গুলো ঈষৎ উষ্ণ করে (৬০^{o}C) মোমগুলো অপসারণ করে Hematoxylene এবং Eosin (H & E) অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ রং দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। এরপর স্লাইডগুলো শুকানোর পর মাইক্রোসকোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে রেকর্ড করা হয়। এভাবে স্বাভাবিক টিস্যুর সংগে তুলনা করে রোগাক্রান্ত অবস্থা শনাক্ত করা হয়।

হিস্টোলজী পদ্ধতির মাধ্যমে রোগাক্রান্ত কলার অবস্থা শনাক্তকরণ করা যায়। এছাড়া রোগ-জীবাণু গুলো প্রাথমিক ভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয় বলে এ পদ্ধতিটি একটি অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি।

অনুশীলন (Activity) ঃ একটি কার্পজাতীয় মাছ ও একটি চিংড়ির বহির্ভাগে রোগাক্রান্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি লিখুন। এদের ব্যবচ্ছেদ করার পদ্ধতি লিখুন এবং আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির রোগাক্রান্ত অবস্থা শনাক্ত করার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

সারমর্মঃ রোগাক্রান্ত অবস্থা শনাক্তকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা একান্ত জরুরী। তা ছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে রোগজীবাণু শনাক্ত করতে হলে এদর আলাদা করে নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এজন্য চাই মাছ হউক বা চিংড়ি হউক প্রয়োজনে তা ব্যবচ্ছেদ করে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। মাছের ক্ষেত্রে দেহের উপরিভাগ, ফুলকা, লিভার, কিডনী অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আর চিংড়ির জন্য হেপাটোপ্যাংক্রিয়াস, লিম্ফয়েড অঙ্গ, হৃদপিন্ড, ক্যারাপেসের অভ্যন্তর ভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ। রোগজীবাণুর মধ্যে অতি আণুবিক্ষনিক ভাইরাস টিস্যু কালচার বা Cell Line এ কালচার করে পরীক্ষা করতে হয়। ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাক কৃত্রিম কালচার মিডিয়ামে পরীক্ষা করা যায়। পরজীবীগুলো কালচার মিডিয়াম ছাড়াই মাইক্রোসকোপের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব। হিস্টোলজী পদ্ধতির মাধ্যমে মাছ বা চিংড়ির বিভিন্ন অঙ্গের কলার রোগাক্রান্ত অবস্থা শনাক্ত করতে পারা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৫

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক) মাছ ও চিংড়ির ব্যবচ্ছেদের কোন্ উপকরণ বেশি প্রয়োজন?

i) কাঁচি
ii) তুলি
iii) সুঁচ
iv) চিমটা

খ) মাছের শরীরের বহির্ভাগে সাধারণত কোন্ পরজীবী পাওয়া যায় ?

i) *Cymothoa*
ii) *Myxobolus*
iii) *Argulus*
iv) জোঁক

২। সত্য হলে "স" এবং মিথ্যা হলে "মি" লিখুন।

ক) হিস্টোলজিক্যাল পদ্ধতিতে মাছের সব রকম রোগের শনাক্তকরণ সহজ হয়।

খ) কালচার মিডিয়াম ব্যাকটেরিয়া পৃথকীকরণ করতে সবচেয়ে প্রয়োজন।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) হিস্টোলজিক্যাল পদ্ধতি ---------- ও ---------- রং বেশি ব্যবহৃত হয়।

খ) চিংড়ির ব্যবচ্ছেদ দেহের ---------- থেকে করা সঠিক।

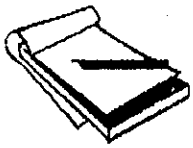

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নবলী

১। পরিবেশ বলতে ক বুঝায়? মাছ, পরিবেশ ও রোগজীবাণুর পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করুন।
২। মাছ/চিংড়ি চাষে পারিবেশিক ভৌত ও জৈবিক প্রভাবকসমূহ আলোচনা করুন।
৩। মাছ কিংবা চিংড়ির ওপর পানির রাসায়নিক প্রভাবকগুলোর প্রভাব বর্ণনা করুন এবং এদের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলোর প্রতিকারের উপায় কী হতে পারে তা লিখুন।
৪। মাছের নীলাভ দাগ রোগের বর্ণনা দিন এবং দমনের উপায় কী লিখুন।
৫। মাছে রক্তাল্পতা ঘটার কারণগুলো লিখুন এবং তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দিন।
৬। মাছে থাইরয়েড টিউমার জনিত সমস্যা প্রতিকার সহ বর্ণনা করুন।
৭। চক্ষু প্রসারণ রোগ কী এবং কেন হয়? মাছের ক্ষেত্রে এ রোগের নিয়ন্ত্রন কীভাবে করা যায়?
৮। হ্যাচারিরে মাছের ইউকস্যাক রোগ ও ডিম রোগের বর্ণনা দিন এবং এদের প্রতিকারের উপায় গুলো লিখুন।
৯। মাছের কিডনী ও লিভারের রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
১০। গ্রন্থির কার্যহীনতা বলতে কি বুঝায় ? অগ্ন্যাশয়, পিটুইটারী গ্রন্থি ও যৌন গ্রন্থির কার্যহীনতার বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১
১। ক) ii খ) iv
২। ক) স খ) মি
৩। ক) ০.১১ পি.পি.এম এর উর্ধ্বে নয় খ) মিক্রোমিস্টিক
৪। ক) পানির P^H খ) অ্যানোক্সিয়া

পাঠ ৬.২
১। ক) iii খ) ii
২। ক) স খ) মি
৩। ক) ওজন খ) টিউমার

পাঠ ৬.৩
১। ক) iii খ) iii
২। ক) স খ) মি
৩। ক) বাদামি খ) স্থবির

পাঠ ৬.৪
১। ক) iii খ) iv
২। ক) স খ) মি
৩। ক) অগ্নাশয় খ) নালীবিহীন
৪। ক) Maligrant টিউমার খ) Bacterial kidney Disease

পাঠ ৬.৫
১। ক) i খ) iii
২। ক) স খ) স
৩। ক) H & E খ) পিছন দিক

শব্দকোষ (Glossary)

অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (Oxytetracycline) ঃ এটি এক প্রকার বহুল ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক যা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিকারের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাছ ও চিংড়ি চাষে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ।

অ্যানোক্সিয়া (Anoxia)ঃ পরিবেশের এমন এক অবস্থা যেখানে অক্সিজেন মোটেই নেই। পানিতে দূষণের কারণে কখনও কখনও এমন অবস্থা হয় যা মাছের জন্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

আরগুলোসিস (Argulosis) ঃ Argulus নামক মাছের উকুন দ্বারা সৃষ্ট মাছের রোগকে আরগুলোসিস বলা হয়। এ রোগের ফলে মাছের উপাদান হ্রাস পায়।

ইডেমা (Edema) ঃ কলার অভ্যন্তরস্থ আন্তকোষীয় ফাঁকে তরল জমা হওয়াকে ইডেমা বলা হয়। মাছ রোগাক্রান্ত হলে অনেক সময় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ইয়েলো হেড রোগ (Yellow Head Disease) ঃ চিংড়ির ভাইরাস জনিত একটি রোগ। এর ফলে চিংড়ির সামনের দিক হলুদ বর্ণ হয় এবং মারা যায়। মনোডন ব্যাকিউলু ভাইরাস (MBV) দ্বারা এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

এইচ এন্ড ই (H & E) ঃ হেমাটক্সিলিন এবং ইওসিন নামক দুটো রং যা হিস্টোলজি পদ্ধতিতে কলা ও কোষের রং করার জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

এডিনোমা (Adenoma) ঃ এটা এক প্রকার ক্ষতিকারক নয় (Benign) এমন টিউমার। মাছের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে এবং বিশেষ করে গ্রন্থির কলার মধ্যে এ ধরনের টিউমার দেখতে পাওয়া যায়।

এডিনোকার্সিনোমা (Adenocarcinoma) ঃ এক ধরনের ক্ষতিকারক (Malignant) টিউমার যা গ্রন্থি বা অন্যান্য আভ্যন্তরীন অঙ্গে দেখা যায়। মাছের জন্য এ ধরনের টিউমার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

এন্টিবায়োটিক (Antibiotic) ঃ এর সাধারণ অর্থ হল জীবের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ঔষধ। ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে সাধারণত: এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। যার ফলে ব্যাক্টেরিয়ার মৃত্যু ঘটে কিংবা তার বর্ধন বন্ধ হয়। নানা রকমের Antibiotic বর্তমানে আবিস্কৃত হয়েছে।

এন্টিজেন (Antigen) ঃ যে সকল দ্রব্য (যাদের আণবিক ভর বেশি) কোন প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্ন করে (Immune response) তাকে এন্টিজেন বলে।

এন্টিবডি (Antibody) ঃ এরা এক ধরনের রুপান্তরিত গ্লোবিউলিন - আমিষ উপাদান দিয়ে তৈরি যা সাধারণত এন্টিজেন শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশের ফলে উৎপন্ন হয়।

এস.ই.এম.বি.ভি. (SEMBV) ঃ চিংড়ির মড়ক সাদা দাগ রোগ (White spot disease) সৃষ্টিকারী ভাইরাস। একে অনেকে চায়না ভাইরাস (China Virus) বলে থাকে।

কীটনাশক (Insecticide) ঃ কীট প্রতঙ্গ দমনের জন্য ব্যবহৃত ঔষধ। মাছের ক্ষেত্রেও এ সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় যখন কীট পতঙ্গ জাতীয় পরজীবীর দ্বারা আক্রান্ত হয়।

কুসুম থলি (Yolk sac) ঃ নিষিক্ত ডিম পরিস্ফুটনের পর লার্ভা তার শরীরের যে অংশ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে তাকে কুসুম থলি বলে।

ছানি পড়া (Cataract) ঃ চোখের এক ধরনের রোগ - মাছের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে - অন্তত: এক চোখে। সাধারণত: ভিটামিন -এ অথবা শরীরে প্রয়োজনীয় জিংকের উপাদান কম হলে এরোগ হয়।

টেরামাসিন (Teramycin) ঃ এক প্রকার এন্টিবায়োটিক - যা অক্সিটেট্রাসাইক্লিনের উপাদান দিয়ে তৈরি।

ডিপটেরেক্স (Dipterex) ঃ এক প্রকার কীটনাশক - সাধারণত মাছের উকুন (Argulus), হাঁস পোকা, এ্যাংকর ওয়ার্ম ইত্যাদি দমনে ব্যবহৃত হয়।

ডিহাইড্রেশন (Dehydration) ঃ পানি বা তরল বেরিয়ে শুকিয়ে যাওয়ার নাম ডিহাইড্রেশন। যখন কোন কলা বা কোষের অভ্যন্তরস্থ পানি বা তরলকে বের করে শুকিয়ে ফেলা হয় - যেমন হিস্টোলজী প্রক্রিয়ায় করা হয় - তাকেও Dehydration বলে।

পি.এইচ (pH) ঃ হাইড্রোজেন আয়রনের দশ ভিত্তিক ঋণাত্মক লগারিদমকে পি,এইচ বলা হয়। কোন তরলের বা পানির ক্ষারকীয় বা অম্লীয় অবস্থা এই পি.এইচ এর মাত্রার ওপর নির্ভরশীল।

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) ঃ এক প্রকার রাসায়নিক যৌগ। মৎস্য রোগ চিকিৎসা বা পানির অক্সিজেনের স্বল্পতা ঘটলে ইহা ব্যবহার করা হয়।

পুষ্টিবিরোধী উপাদান (Antinutritional substance) ঃ উদ্ভিদ জাতীয় উৎস থেকে তৈরি মাছের খাদ্য উপাদানের মধ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিদ্যমান থাকে - যেগুলো মাছের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এগুলোই হল পুষ্টিবিরোধী উপাদান।

ফুরাসিন (Furacin) ঃ এক প্রকার এন্টিবায়োটিক - মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভ্যাক্সিন (Vaccine) ঃ কোন প্রাণীর রোগ প্রতিরোধের জন্য জীবাণুর অংশ বিশেষ বা রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা লোপ করে তৈরি এন্টিজেন বা টীকা যা ব্যবহার করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা হয় তাকে ভ্যাক্সিন বলে।

মিথিলিন ব্লু (Methyline Blue) ঃ এক ধরনের নির্দেশক রং যা মৎস্য রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

ম্যালাকাইট গ্রীন (Malachite Green) ঃ এক ধরণের রাসায়নিক রং। সাধারণত ছত্রাক জাতীয় মৎস্যরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মেটাপ্লাসিয়া (Metaplasia) ঃ শরীরের অভ্যন্তরে কলার প্রতিক্রিয়ায় এক ধরনের কলা থেকে অন্য ধরণের কলায় পরিণত হওয়াকে মেটাপ্লাসিয়া বলা হয়।

নেক্রোসিস (Necrosis) ঃ কোন কলার কোষগুলো যখন বিভিন্ন কারণে মরে যায় তখন সেই কলা বা অঙ্গ আস্তে আস্তে ধ্বংস হতে থাকে - এমন অবস্থাকে নেক্রোসিস বলা হয়।

রাসায়নিক চিকিৎসা (Chemotherapy) ঃ রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা উপাদান দ্বারা রোগের চিকিৎসা করাকে রাসায়নিক চিকিৎসা বলে।

রেটিনল (Retinol) ঃ ভিটামিন - A কে রেটিনল বলা হয়। এর অভাবে চোখের অসুখ দেখা দেয়।

রেনাল ক্যালসিনোসিস (Renal Calsinosis) ঃ এটি আমিষের অভাবজনিত রোগ। এর ফলে মাছের বৃক্কে অস্বাভাবিক মাত্রায় ক্যালসিয়াম জমা হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

লারনিয়াসিস (Lernaeasis) ঃ লারনিয়া বা এ্যাংকর ওয়ার্ম নামক বহি:পরজীবী দ্বারা মাছের ত্বকে সৃষ্ট রোগকে লারনিয়াসিস বলা হয়।

লর্ডোসিস (Lordosis) ঃ অস্থির সম্মুখ ভাগে বাঁকা হয়ে যাওয়াকে লার্ডোসিস বলা হয়।

স্কলিওসিস (Scoliosis) ঃ পার্শ্বীয় দেশে অস্থি বাঁকা হয়ে যাওয়াকে স্কলিওসিস বলা হয়।

স্যাপ্রোলেগনিয়াসিস (Saprolegniasis) ঃ স্যাপ্রোলেগনিয়া নামক ছত্রাক মাছের ত্বক, পাখনা ইত্যাদিতে আক্রমণের মাধ্যমে যে রোগের সৃষ্টি করে তাকে স্যাপ্রোলেগনিয়াসিস বলে।

সাদা দাগ রোগ (White Spot Disease) ঃ মাছ এবং চিংড়ির দুটো ভিন্ন রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগ যা সাদা সাদা দাগের মত দেখায়। মাছে এক কোষী পরজীবী, (*Ichthyophthrias multifilis*) এবং চিংড়িতে চায়না ভাইরাস বা SEMB দ্বারা আক্রান্ত হলে যে রোগ হয় তাকে সাদা দাগ বলা হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নাম একই হলেও দুটো রোগ সম্পূর্ণ আলাদা।

সংক্রমন (Infection) ঃ কোন জীব দেহে রোগ সৃষ্টিকারী ঘটক বস্তু বা রোগজীবাণু প্রবেশের পর যদি ঐ জীবের পোষকের মধ্যে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে তা হলে তাকে সংক্রমন বলে।

হেমোরহেজ (Haemorrhage) ঃ শরীরের কোন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হওয়াকে হেমোরহেজ বলে।

হাইপোক্সিয়া (Hypoxia) ঃ কোন মাধ্যমে, যেমন - পানিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ (দ্রবীভূত) অক্সিজেনের অভাব বা কম থাকলে তাকে হাইপোক্সিয়া বলে।

হিমোলিম্ফ (Haemolymph) ঃ রক্ত মিশ্রিত দেহ তরল। চিংড়ির রোগ নিরূপণের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

হেপাটোপ্যাংক্রিয়াস (Hepatopancreas) ঃ যকৃত এবং অগ্ন্যাশয়ের সংমিশ্রণ। চিংড়ির জন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি।

হিস্টোলজী (Histology) ঃ কোন কলার অণুবীক্ষনিক পর্যবেক্ষণ। রোগ শনাক্তকরণের জন্য একটি উত্তম পদ্ধতি।

তথ্যসূত্র

1. মৎস্য পক্ষ সংকলন '৯৩ (১৯৯৩)। মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
2. মৎস্য পক্ষ সংকলন '৯৬ (১৯৯৬)। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ।
3. FRI, (1988). Training on Composit Carp Culture, A Training Manual, Mymensingh, Bangladesh.
4. FRI, (1991). Improved Fish Culture Management Practices, A Trainers Training Manual for Fisheries Extension Officers, Bangladesh.
5. Hepher, B. and Pruginin (1981). Commercial Fish Farming, John Willy & Sons Inc. USA.
6. Huet, M. (1979). A Text Book of Fish Culture, Breeding and Cultivation Fish, Fishing News Books Ltd. Farnham, Enland.
7. Islam, M.A., Bhuian, M.H., Haque, M.A., and Alauddin, M. (1996). Agricultural Education, National Curriculum & Text Book Board, Dhaka, Bangladesh.
8. Islam, M.A. (1997). Fish Feed and Nurtition, Bangladesh Technical Education Board, Dhaka, Bangladesh.
9. Jingran, V.G. and Pullin, R.S.V. (1985). A hatchery Manual for the common, Chinese and Indian Major Carps, ADB-ICLARM, Metro Manila, Phillipine.
10. NACA Technical Manual 7 (1989). Integrated Fish Farming in China, Asian-pacific Regional Research & Training Centre, Bankok, Thailand.
11. Pillay, T.V.R (1993). Aquaculture: Principles & Practices, Fishing News Book, 25 John Street, London WCIN 2BL.